Vol. 55 | No. 2 | 2018

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# রবীন্দ্রনাথের নীতিকাব্য : কণিকা

| | |
|---|---|
| Volume | 55 |
| Issue | 2 |
| Year | 2018 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | মো. ফখরুল ইসলাম |
| Published online | February 1, 2018 |
| DOI | 10.62328/sp.v55i2.6 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v55i2.6 |
| Pages | ১২৩-১৩৬ |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৫ ॥ সংখ্যা : ২ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

# রবীন্দ্রনাথের নীতিকাব্য : *কণিকা*

**মো. ফখরুল ইসলাম***

সার-সংক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিকর্ম শতধারায় প্রবাহিত। গীতিকবি হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ববাসীর স্বীকৃতিধন্য। গীতিকবিতার নানা প্রকরণের সাক্ষাৎ তাঁর কাব্যধারায় সুলভ। প্রকরণগত দিক থেকে *কণিকা* রবীন্দ্র-কাব্যধারায় একটি ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। আঙ্গিকগত বিশিষ্টতা একে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। *কণিকা*র দুই, চার, ছয় পঙ্‌ক্তির কবিতাগুলোতে কবি অল্পকথায় উপমা, রূপক, সংকেতে তুলে ধরতে চেয়েছেন জগত-জীবন সম্পর্কিত তাঁর অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি। কবিতাগুলোর গাঠনিক ও বিষয়বস্তুগত দিক বিবেচনা করে আমরা *কণিকা*কে নীতিকাব্য বলতে চেয়েছি। বর্তমান আলোচনায় নীতিকবিতার রূপ ও বিষয়গত দিক আলোচনা করে *কণিকা*র কবিতাগুলোর সঙ্গে এসবের সাদৃশ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। *কণিকা* কাব্যের বিষয়, ভঙ্গি এবং ভাবগত অভিব্যক্তি বিবেচনা করে আমরা এর কবিতাসমূহকে কতগুলো শ্রেণি-উপশ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছি। জগৎ-জীবন, সমাজ, লোকচারিত্র্য ও সাহিত্য এ-চারটি বিষয়ে *কণিকা*র কবিতাগুলোতে কবির যেসব উপলব্ধি রূপ পেয়েছে তার অনুসন্ধানই আমাদের লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ লিরিক কবি। লিরিকের পৃথকত্ব কেবল সুরে নয়, স্বরেও। লিরিকের নানা আঙ্গিকেই পদচারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'মিতব্যয়ী অভিব্যক্তি' হিসেবে লিরিকের অনন্যতা স্বীকৃত। নাতিদীর্ঘ কাহিনিকাব্য, সনেট, নাট্যকাব্য প্রভৃতির পাশাপাশি তিনি কিছু কিছু ক্ষুদ্রায়তন কাব্যও রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এ-সব 'স্মিতবাক্', 'মিতচরণ' কবিতার দেখা মেলে *কণিকা*, *লেখন*, *স্ফুলিঙ্গ*, *খাপছাড়া* প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে।

শিলাইদহ-শাহজাদপুর বসবাসকালে অর্থাৎ ১৩০৩-১৩০৬ বঙ্গাব্দের মধ্যে রচিত হয় 'লিরিকের ক্ষণজীবী অভিব্যক্তি' *কণিকা*র কবিতাগুলো। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে ১১০টি ক্ষুদ্রাঙ্গী কবিতার সংকলন *কণিকা* প্রকাশিত হয়। আমরা জানি, 'সংহতি, ভাবঘনতা, গাঢ়বন্ধ বাকসংযমতা রবীন্দ্রনাথের কবি স্বভাবেরই একটি নিজস্ব প্রবণতা।' (বসু ১৯৮৭ : ৬)। এ-সব বৈশিষ্ট্য *কণিকা* কাব্যেও সুপ্রকাশিত। ক্ষুদ্রায়তন এ-সব কবিতা রচনার পেছনে একটি কারণের উল্লেখ করেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

---

* সহকারী অধ্যাপক, রবীন্দ্র অধ্যয়ন বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i2.6

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ সময় ব্যবসায়িক-পারিবারিক কিছু বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন বলে নিরুদ্বিগ্ন সাহিত্যচর্চায় ব্যাঘাত ঘটেছিল। তিনি লিখেছেন –

> নতুন কিছু লিখিতেছেন না, লিখিবার প্রেরণাও নাই। জমিদারি ও ব্যবসায় সংক্রান্ত বহুবিধ জঞ্জাল যাহা জুটিয়াছিল, তাহার হিসাবনিকাশ, বলেন্দ্রনাথের পীড়াজনিত উদ্‌বেগ, পুত্রকন্যাদের জন্য শিলাইদহে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যবস্থাজনিত সমস্যা তাঁহার শরীর ও মনকে ক্লান্ত করিতেছে। নূতন লেখা সামান্যই চোখে পড়ে। সুমহৎ চিন্তা ও সুবৃহৎ সাহিত্যসৃষ্টির জন্য সুপ্রশস্ত অবসরের প্রয়োজন। সে অবসর নাই, মনেও শান্তি নাই; তাই অবসর সময়ে লিখিতেছেন কণিকার কবিতা। (মুখোপাধ্যায় ১৩৫৩ : ৩৫৯-৬০)।

রবীন্দ্র-কাব্যধারায় *কণিকা* একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। সত্য, সুন্দর, কল্যাণ এ ত্রিবেণীর সঙ্গম রবীন্দ্র-সৃষ্টিপুঞ্জ। কালের পরিক্রমায় এদের কোনো কোনোটি কখনো কখনো কবির অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এ নিরিখে *কণিকায়* সত্যের পরাক্রম। '*কণিকার* মধ্যে যে সব তত্ত্ব কবিতাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পৃথিবী সম্বন্ধে অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয়লব্ধ সত্য।' (মুখোপাধ্যায় ১৩৫৩ : ৩৫৯-৬০)। বিষয় পরিচর্যায় নীতির গভীর সংযোগ *কণিকার* ব্যতিক্রমধর্মিতার প্রধান কারণ।

আঙ্গিক ও বিষয়গত পরিচর্যার দিক লক্ষ্য করে *কণিকাকে* নীতিকবিতা বলতে হয়। প্রাচ্যে যা নীতিকবিতা প্রতীচ্যে তা Epigram। গ্রীক 'Epigraphein' শব্দ থেকে Epigram এর উদ্ভব। প্রাচীন গ্রীসে পাথরস্তম্ভে খোদাই করে লেখাকে Epigraphein বলা হতো। পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বে Epigram-কে বলা হয়েছে:

ক. An epigram is a short, pithy saying, usually in verse, often with a quick satirical twist at the end. The subject usually a single thought or event.

খ . An epigram is a short, often satirical poem dealing concisely with a single subject and usually ending with a witty or ingenious turn of thought.

গ. An epigram is a brief, interesting, memorable and sometimes surprising or satirical statement.

ঘ . An epigram is a short satirical and witty poem. Usually written as a couplet or quatrain but can also just be a one line phrase. It is a brief and forceful remark with a funny ending.

ঙ. As a rule a short, witty statement in verse or prose which may be complimentary, satiric or aphoristic. (Cuddon,1977, p. 235)

সংজ্ঞার্থগুলো থেকে এপিগ্রামের কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায় : যেমন, একটিমাত্র বিষয় অবলম্বনে তা রচিত হয়। আকারে সংক্ষিপ্ততা এবং ভাবঘন, সারগর্ভ বক্তব্য এর অন্যতম গুণ। আকস্মিক ব্যঙ্গপূর্ণ মোচড় তৈরি এবং সমাপ্তিতে বিস্ময় কিংবা হাস্যরস পরিবেশনের চেষ্টা এতে লক্ষ করা যায়। এর অবয়ব গঠিত হয়

সাধারণত দুই অথবা চার পঙ্‌ক্তিতে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা পদ্যে রচিত হয়। এ-ধরনের মিতায়তন কবিতা-চর্চার ইতিহাস পাশ্চাত্যে বেশ পুরোনো। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে Epigram-এর ব্যাপক চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যে যে-সকল কবি নীতিকবিতার চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য – জন ডান, বেন জনসন, জন ড্রাইডেন, রবার্ট হেরিক, আলেকজান্ডার পোপ, স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ প্রমুখ। এ প্রসঙ্গের ইতি টানব একটি Epigram উদ্ধৃত করে যাতে কোলরিজ Epigram কে চমৎকারভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন : What is an Epigram? A dwarfish whole; its body brevity, and wit its soul.

লিরিকের মিতায়তনিক বৈশিষ্ট্যের একটা বাধা-ধরা কাঠামো সনেটে রয়েছে। সনেটের আট, ছয় পঙ্‌ক্তি বিন্যাস বেয়ে গড়ে উঠেছে Curtal Sonnet নামের দশ পঙ্‌ক্তির কবিতা। জি. এম হফকিন্স এর প্রিফেস টু পোয়েমস্ এ ধরনের ৬ ও ৪ পঙ্‌ক্তির দুই স্তবক বিশিষ্ট Curtal Sonnet-এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। *কণিকা*তে রবীন্দ্রনাথ ৬, ৮, ১০, ১২ পঙ্‌ক্তির কবিতা রচনা করেছেন, কিন্তু কোনোটিই একাধিক স্তবকবিশিষ্ট নয়। মিত্রাক্ষর পয়ারে রচিত এ-ধরনের কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো ১৪ মাত্রাবিশিষ্ট, ৮ এবং ৬ মাত্রার পর্ব বিভাগ লক্ষ করা যায়।

উপদেশ বা নীতিকথা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত কবিতাকে বাংলা ভাষায় নীতিকবিতা বলে চিহ্নিত করা হয়। (রহমান ২০১১ : ১১৯)। নীতিকবিতায় সরাসরি নীতিকথা ব্যক্ত হতে পারে আবার কাব্য মাধুর্যের আড়ালেও নীতিকথা প্রচারিত হতে পারে। নীতিকবিতা উদ্দেশ্যমূলক রচনা। নীতিকবিতা রচনার পেছনে মূলত দুটি উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থাকে। এক, উদ্দিষ্ট বিষয়ে পাঠককে সচেতন করে তোলা ও দুই, তত্ত্বকথার মাধ্যমে জগত-জীবন ও লোকচরিত্র সম্পর্কে ধারণা দান।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯ খ্রি.), কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৭-১৯০৬ খ্রি.) বাংলায় নীতিকবিতা রচনা করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নীতিকবিতাসমূহ তাঁর রচনাবলিতে একত্রে পাওয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের নীতিকাব্য *সদ্ভাবশতক* (১৮৬১ খ্রি.)। "যেজন দিবসে মনের হরষে / জ্বালায় মোমের বাতি/ আশু গৃহে তার দেখিবে না আর / নিশীথে প্রদীপ ভাতি" কৃষ্ণচন্দ্রের বহুলপঠিত নীতিকবিতার অংশবিশেষ। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন, স্বল্পায়ু রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০ খ্রি.) কিছু নীতিকবিতা লিখেছিলেন। *অমৃত* (১৯১০ খ্রি.) তাঁর অন্যতম নীতিকবিতার সংকলন। এতে ৪৮টি কবিতা রয়েছে। এছাড়া *সদ্ভাবকুসুম* (১৯১৩ খ্রি.) নামে তাঁর আরও একটি নীতিকাব্য রয়েছে। "তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল" এই কবিতাটি 'পরোপকার' শিরোনামায় তাঁর বিখ্যাত কবিতা। তাঁর অপর একটি নীতিকবিতা 'স্বাধীনতার সুখ' স্কুলপাঠ্যের সুবাদে আমাদের নিকট সুপরিচিত। কবিতাটির প্রথম

দুটি চরণ এরূপ : "বাবুই পাখিরে ডাকি , বলিছে চড়াই, / কুঁড়ে ঘরে থাকি কর শিল্পের বড়াই"। এখানে যেসকল কবির কবিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাতে দেখা যায় বক্তব্যে নীতিপ্রচারই তাদের লক্ষ্য ছিলো। নীতিকবিতার আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সে-সবের খুব একটা সাদৃশ্য নেই।

পূর্ব-উল্লেখিত সংজ্ঞার্থগুলোতে Epigram-এর যেসব প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞাপিত হয়েছে তার সবগুলোই *কণিকায়* সুলভ। কেবল আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। *কণিকার* ১১০টি কবিতার মধ্যে দুই পঙ্‌ক্তির কুড়িটি, চার পঙ্‌ক্তির চৌষট্টিটি, ছয় পঙ্‌ক্তির চারটি, আট পঙ্‌ক্তির সাতটি, দশ পঙ্‌ক্তির এগারটি এবং বারো পঙ্‌ক্তির চারটি কবিতা রয়েছে। Epigram এর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে *কণিকার* দুই ও চার পঙ্‌ক্তির চুরাশিটি কবিতাকে নীতিকবিতা হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের এই কাব্য বিদগ্ধজনের সুদৃষ্টি ততোটা লাভ করেনি। রবীন্দ্রকাব্যের ধারাবাহিক আলোচনা যে-সব সমালোচক করেছেন তাঁদের অনেকে একে আলোচ্য করেননি, অনেকে নিতান্ত অবহেলাভরে দুএকটি অনুচ্ছেদ এর জন্য বরাদ্দ করেছেন এবং তাতেও কোনো প্রশংসাবচন বর্ষিত হয়নি। অনেকে একে ছড়া বা বচন জাতীয় রচনা বলেছেন। অনেকের মতে, এটা রবীন্দ্রনাথের দুই পর্বের মাঝে 'বিশ্রাম-বিলাস'। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-আলোচক নীহাররঞ্জন রায়ের *কণিকার* মূল্যায়ন উদ্ধার করা যায় :

> *কণিকার* অধিকাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিমেরিক জাতীয়। ইহাদের প্রেরণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোথাও তত্ত্বমূলক, কোথাও উপদেশমূলক; কোথাও ব্যঙ্গ-হাস্যমূলক। কতকগুলি দুই অথবা চার লাইনের ছড়াও আছে যাহা কতকটা 'বচন' জাতীয়, যেমন,
>
> দেহটা যেমনি করে ঘোরাও যেখানে
> বাম হাত বামে থাকে ডান হাত ডানে
>
> অথবা,
>
> উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে;
> তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।
>
> যথার্থ কাব্যরসের সার্থক প্রকাশ এ-সব কবিতায় প্রায় অনুপস্থিত, তবে এমন কবিতাও আছে –
>
> ওগো মৃত্যু, তুমি যদি হতে শূন্যময়
> মুহূর্তে নিখিল তবে হয়ে যেত লয়।
> তুমি পরিপূর্ণ রূপ – তব বক্ষে কোলে
> জগৎ শিশুর মতো নিত্যকাল দোলে। (রায় ১৩৬ : ৮৩)

অন্যদিকে এ-কাব্যের যথার্থ মূল্যায়ন প্রচেষ্টাও লক্ষ করা যায় কোনো কোনো সমালোচকের লেখায়। যেমন,

> জগতের প্রত্যেক বিষয় ও বস্তুকে অ-সাধারণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও সত্যকে কবি অতি অল্প কথায় অপূর্ব কবিত্বমণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের তলদেশে গভীর জ্ঞান, নিপুণ শ্লেষ ও প্রচ্ছন্ন নীতির একটা ধারা প্রবাহিত হওয়ায় এই ক্ষুদ্র কবিতাগুলি বাংলা-সাহিত্যের এক মহামূল্য সম্পদে পরিণত হইয়াছে। অতি ক্ষুদ্রাবয়ব এক একটি কবিতার মধ্যে এক একটি ভাব চমৎকার উপমা, শ্লেষ ও আপাত-বৈষম্যের সাহায্যে পাঠকের চিত্তে অপূর্ব বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, এবং উহার সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য ও সর্বশেষে উহার ইঙ্গিত, মুগ্ধ পাঠকের চিত্তে গভীর রেখাপাত করে। (ভট্টাচার্য ১৩৯৩ : ৩৮৩)

*কণিকা* কাব্যে কবির জগত ও জীবন সম্পর্কিত সত্য উদ্‌ঘাটন ও তার রূপায়ণ কৌশল এবং মনোভাবের প্রতি লক্ষ করে আমরা নিম্নোক্ত শ্রেণি-উপশ্রেণিতে কবিতাগুলোকে ভাগ করতে পারি :

**এক, তত্ত্বান্বেষী** : সত্যের আবিষ্কার এবং তার প্রতিষ্ঠা তত্ত্বের লক্ষ্য। এ-শ্রেণিতে আমরা সেসব কবিতাকে বিন্যস্ত করতে পারি, যেগুলোতে রূপায়িত হয়েছে জগত-জীবন নিষ্কাশিত সত্য। মানুষের সীমাবদ্ধতা, চারিত্র্যগত সত্যের পাশাপাশি জগত সম্পর্কিত কবির আত্মোপলব্ধি, কত বৃহৎ-মহৎ সত্য নিতান্ত সহজ সরল ভাষায়, নানাবিধ চিত্র ও উপমার সাহয্যে কবি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

পরস্পর নির্ভরশীল সমাজে জীবনধারণ ও যাপনে মানুষ স্বয়ম্ভর নন। শক্তির দম্ভে স্বল্পক্ষণ এ-সত্য ভুলে থাকা চলে কিন্তু তাতে সত্যটি একেবারে ঢাকা থাকে না। মানুষের শক্তির সীমাবদ্ধতা কবি আলো ও সূর্যের অনুষঙ্গে তুলে ধরেছেন 'শক্তির শক্তি' কবিতাটিতে। সূর্যের আলো ব্যতীত চোখ কোনো কিছু দেখতে পায় না, রাত হলে এ-সত্য অস্বীকার করার উপায় থাকে না।

রূপ বাইরের, গুণ ভেতরের। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাহ্যরূপ আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করে। কাজেই রূপ দেখে ব্যক্তি কিংবা বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় সবসময় সঠিক হয় না। এ-রকম সত্য কবি রূপায়িত করেছেন বেশকিছু কবিতায়, যেমন, 'জ্ঞানের দৃষ্টি ও প্রেমের সম্ভোগ' কবিতায় আমাদের অতি-পরিচিত ফল জামের মুখ দিয়ে কবি বলাচ্ছেন, 'যে আমার কালো রূপ দেখে ফিরে গেল সে জানতে পারলো না আমি কতো স্বাদু।'

জগতে নিরঙ্কুশ ভালো কিংবা নিরঙ্কুশ মন্দ বলে কিছু নেই, এখানে ফুল আর কাঁটা পাশাপাশি বিরাজ করে। ভালো-মন্দ মিলিয়েই জগৎ-সংসার। এমন সত্যের রূপায়ণে কবি গ্রহণ করেছেন প্রাত্যহিক জীবনের জাল ফেলে মাছ ধরার প্রসঙ্গ। জলাশয়ে জাল ফেললে মাছের সঙ্গে কিছু কাদা-পাঁকও উঠে আসে। আমরা কেবল মাছগুলোকে জাল থেকে ছাড়িয়ে নিই। তেমনিভাবে জাগতিক ব্যাপারে মন্দটাকে পরিত্যাগ করে ভালোটাকে গ্রহণ করতে হয়। এমনি করে এ-শ্রেণির কবিতাগুলোতে রবীন্দ্রনাথ জগৎ-জীবনের সত্যগুলোকে রূপায়িত করেছেন।

ক. জ্ঞানাত্মক : 'খেলেনা', 'অল্প জানা ও বেশি জানা', 'পর-বিচারে গৃহভেদ', 'অসাধ্য চেষ্টা', 'ভালো-মন্দ', 'একই পথ', 'ধ্রুবানি তস্য নশ্যন্তি', 'স্তুতি ও নিন্দা', 'আদিরহস্য', 'অদৃশ্যকারণ', 'জীবন', 'ছলনা', ' বস্ত্রহরণ', 'মৃত্যু'।

খ. সত্যরূপ উদ্ভাসী : 'সন্দেহের কারণ', 'পরিচয়', 'স্পষ্টভাষী', 'অচেতন মাহাত্ম্য', 'গরজের আত্মীয়তা', 'কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ', 'মাঝারির সর্তকতা', 'গ্রহণে ও দানে', 'তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে', 'বলের অপেক্ষা বলী', 'স্বাধীনতা', 'বিফল নিন্দা', 'অপরিবর্তনীয়', 'স্পষ্টসত্য', 'শক্তির শক্তি'।

গ. মূল্য অবধারণ সমস্যা : 'অকর্মার বিভ্রাট', 'হার–জিত', 'ভার', 'উচ্চের প্রয়োজন', 'প্রকারভেদ', 'মূল', 'জ্ঞানের দৃষ্টি ও প্রেমের সম্ভোগ', 'গদ্য ও পদ্য', 'নূতন ও সনাতন', 'অনাবশ্যকের আবশ্যকতা', 'সুখ দুঃখ'।

ঘ . পরগুণ হরণ : 'গুণজ্ঞ', 'দানরিক্ত', 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ'।

ঙ . জন্মঋণ অস্বীকার প্রবণতা : 'যথার্থ আপন', 'অকর্মার বিভ্রাট', 'রাষ্ট্রনীতি', 'নম্রতা', 'অকৃতজ্ঞ'।

চ. পরিণামগত ঐক্য : 'নতিস্বীকার', 'পরস্পর', 'ফুল ও ফল', 'প্রশ্নের অতীত', 'অনুরাগ ও বৈরাগ্য', 'চালক', 'সত্যের আবিষ্কার', 'আরম্ভ ও শেষ', 'চিরনবীনতা', 'ধ্রুবসত্য', 'একপরিণাম'।

ছ. স্বসীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অচেতনতা : 'শক্তির সীমা', 'অসম্পূর্ণ সংবাদ', 'নদীর প্রতি খাল', 'কলঙ্কব্যবসায়ী', 'শত্রুতাগৌরব', 'কুয়াশার আক্ষেপ', 'মোহের আশঙ্কা'।

**দুই, উপদেশাত্মক :** ভঙ্গিগত দিক থেকে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে বেশ কিছু কবিতায় কবি সরাসরি আমাদের সত্যগ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছেন। যেমন, কবি 'সুসময়' কবিতায় বলছেন :

ভিজিয়া নরম হল শুষ্ক মরু মন,
এই বেলা শস্য তোর করে নে বপন।

বর্ষাকাল এসে গেলে চাষী কর্মহীন গৃহবন্দি হয়ে পড়ে। কবি, কৃষককে সে-সময় বলছেন, রুক্ষ-শুকনো মাটি বর্ষার ধারাজলে ভিজে নরম হয়েছে, তাই এখনই শস্য বপন করার উপযুক্ত সময়। কাজেই কৃষক যদি ফসল ফলাতে চায় তবে গৃহসুখ পরিত্যাগ করে এখনই মাঠে নেমে পড়তে হবে। কবিতায় এ-আহ্বান সরাসরি ও সুস্পষ্ট।

অপূর্ণতা প্রতিটি মানুষের জীবনেই উপস্থিত। তা অস্বীকার্য এবং অচিকিৎস্যও বটে। এরূপ চিরন্তন সত্যের উদ্ভাসনে কবি 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতায় উদাহরণ দিচ্ছেন আম ও ইক্ষুর। আমের মধ্যে রয়েছে রস, মিষ্টতা এবং সুগন্ধ; অন্যদিকে ইক্ষু রসালো ও সুমিষ্ট

কিন্তু সুগন্ধহীন। সুগন্ধের লোভে ইক্ষু আম হতে চাইলে ইক্ষুর ইক্ষুত্ব বজায় থাকে না। কাজেই আমাদের অপূর্ণতাকে স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

'প্রভেদ' কবিতায় কবি অর্থগতভাবে প্রায় সমীপবর্তী দুটো শব্দের আন্তরভেদ প্রকাশ করেছেন। শব্দদুটো – অনুগ্রহ ও করুণা। অনুগ্রহ যিনি করেন, তাঁর মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে – তিনিও অন্যসময় অপর কর্তৃক অনুগ্রহ লাভ করবেন। অর্থাৎ অনুগ্রহের পশ্চাতে থাকে প্রাপ্তির প্রত্যাশা। অন্যকথায়, একেবারে নিঃস্বার্থ হতে পারে না অনুগ্রহ। অপরপক্ষে করুণা যিনি করতে পারেন তিনি অপরপক্ষ থেকে কোনো কিছুর প্রত্যাশা রাখেন না। করুণা তাই নিঃস্বার্থ। কবির ভূমিকা এখানে অনেকটা উপদেষ্টা কিংবা গুরুর অনুরূপ। এ-ধরনের বিষয়াবলি ও কবির মনোভঙ্গিগত অভীষ্টের প্রতি লক্ষ রেখে কয়েকটি কবিতাকে নিম্নোক্ত উপশ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায় :

ক. উপদেশমূলক : 'যথাকর্তব্য', 'স্বদেশদ্বেষী', 'অপরিহরণীয়', 'সুসময়'।

খ. স্বস্থানের অস্বস্তি : 'নূতন চাল', 'নিন্দুকের দুরাশা', 'প্রবীণ ও নবীন', 'আকাঙ্ক্ষা', 'মোহ'।

গ. ঔদার্য : 'শক্তের ক্ষমা', 'উদারচরিতানাম্', 'নিজের ও সাধারণের', 'দীনের দান', 'সজ্ঞান আত্মবিসর্জন'।

ঘ. ভালোমন্দ প্রভেদক : 'সন্দেহের কারণ', 'ভক্তি ও অতিভক্তি', 'প্রভেদ', 'অস্ফুট ও পরিস্ফুট', 'সত্যের সংযম', 'সৌন্দর্যের সংযম'।

**তিন, ব্যঙ্গাত্মক :** *কণিকা* কাব্যের কতগুলো কবিতায় কবির ব্যঙ্গপূর্ণ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। মূলত কবি এখানে মানব স্বভাবের ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ করেছেন এসবকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আকারে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

'নিরাপদ নীচতা'য় বর্ণিত হয়েছে নিষ্কলঙ্ক লোকের বিপদ। যে-জন কাদা-পাঁকে নিমজ্জিত হয়ে পাঁক ছড়াচ্ছে তার তো দিগ্‌বিদিক জ্ঞান নেই, যে-কোনো দিকেই সে পাঁক ছুড়বে। এ–ধরনের লোক থেকে নিরাপদ থাকার উপায় নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা। নীচ যে-জন তার লক্ষ্যই থাকে তার চেয়ে উত্তম অবস্থানে থাকা লোকটিকে টেনে নিচে নামানো অথবা তার সমতলে নিয়ে আসা।

'গালির ভঙ্গি' কবিতায় কবি দেখাচ্ছেন – একই স্থান থেকে উৎপন্ন বস্তু আকৃতি ভেদে ভিন্ন নাম গ্রহণ করেছে। ছড়ি ও লাঠি উভয়ই বাঁশ থেকে জাত। আকৃতিগত ভিন্নতা সূচিত করেছে তাদের কাজের ভিন্নতাও। তাই একে অপরকে সরু ও মোটা বলে গাল দিয়ে লাভ নেই, যে যে-কাজে উপযুক্ত মানুষ তাকে সে-কাজেই ব্যবহার করবে। সমাজে বৃত্তিগত ক্ষুদ্র-মহতের প্রচলিত ধারণার এক ধরনের অসারতাকেই কবি নির্দেশ করেছেন। আমাদের যাপিত জীবনে উভয়েরই অপরিহার্যতা অবশ্য স্বীকার্য।

মৌমাছি, বোলতার চেয়ে আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু সুন্দর মৌচাক সে-ই তৈরি করতে পারে। মৌমাছির মৌচাক তৈরি করতে পারার গর্বকে বোলতা গলার জোরে খর্ব করতে পারে কিন্তু যা সে পারে না তা হলো মৌমাছির মতো মৌচাক গড়তে। 'হাতে-কলমে' কবিতায় কবি দাম্ভিক বোলতার অনতিক্রম্য সীমাবদ্ধতা এবং নিষ্ফল অহংকারকে ব্যঙ্গ করেছেন। এ-রকমভাবে কিছু কবিতায় কবি ব্যঙ্গের মাধ্যমে আমাদের সচেতন করার প্রয়াস পেয়েছেন। উপস্থাপনগত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ করে আমরা এধরনের কবিতাগুলোকে নিম্নোক্ত উপশ্রেণিতে বিভক্ত করছি :

ক. ব্যঙ্গ-হাস্যমূলক : 'অসম্ভব ভালো', 'নিরাপদ নীচতা', 'কর্তব্য গ্রহণ'।

খ. মূর্খের বিচার : 'ঈর্ষার সন্দেহ', 'কীটের বিচার', 'অধিকার', 'এক-তরফা হিসাব', 'নদীর প্রতি খাল', 'পরের কর্ম-বিচার', 'গালির ভঙ্গি'।

গ. ঈর্ষা : 'চুরি নিবারণ', 'আত্মশত্রুতা' ।

ঘ. অসারের তর্জন-গর্জন : 'হাতে কলমে', 'সমালোচক', 'কৃতীর প্রমাদ', 'স্পর্ধা', 'আযোগ্যের উপহাস', 'ক্ষুদ্রের দম্ভ', 'উপলক্ষ'।

ঙ. ক্ষুদ্রের বৃহদত্বগৌরব : 'প্রতাপের তাপ', 'সাম্যনীতি', 'কুটুম্বিতা-বিচার', 'পর ও আত্মীয়'।

চ. মহতের গৌরবনাশ : 'হার জিত', 'ভিক্ষা ও উপার্জন', 'ভক্তিভাজন', 'মহতের দুঃখ'।

ঈশপের নীতিগল্পে যেমন উপাদান হিসেবে জীব-জন্তু গৃহীত, জাপানি হাইকুতে যেমন প্রকৃতি থেকে উপাদান সংগৃহীত তেমনি রবীন্দ্রনাথের *কণিকা*তেও উপাদান হিসেবে গাছপালা জীব-জন্তুকে বেছে নেয়া হয়েছে। নদী-সাগর, চাঁদ-সূর্য, লতা-পাতা, ফুল-প্রজাপতি, এসবের সঙ্গে সঙ্গে অনেক গার্হস্থ্য দ্রব্য যেমন থলি-ঝুড়ি, প্রদীপ, লাঙ্গল, কাঠ, কুঠার, ঘটি, ছাতা প্রভৃতিকে কবি উপাদান হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এসব উপাদান ব্যবহার করে কবি রূপকের আড়াল তৈরি করেছেন। কবির লক্ষ্য জগত ও জীবনের সত্যরূপ উদ্‌ঘাটন, ব্যক্তির বা লোকচরিত্রের দোষ-গুণ, সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ, রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার অসংগতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো। ঐসব উপাদান খুব কার্যকরভাবেই কবির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হয়েছে। উপরের উপশ্রেণিতে বিন্যস্ত কবিতাগুলোর বিষয়গত বিশ্লেষণ আমাদের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবে।

আমরা বর্তমান আলোচনায় চারটি বিষয়কে অবলম্বন করে কবির অভিপ্রায়কে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করবো। বিষয় চারটি : এক. জগৎ ও জীবন, দুই. সমাজ, তিন. লোকচারিত্র্য, চার. সাহিত্য।

এক, **জগৎ ও জীবন** : রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুতে জীবনের শেষ একথা বিশ্বাস করতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের একটি নতুন দরজা অতিক্রম করে মানুষ। 'জীবন' কবিতায় এই ভাবেরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় : "জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা / যেমন চলার অঙ্গ পা তোলা পা ফেলা।" (ঠাকুর ১৪০১ : ৩১)। মৃত্যু সম্পর্কিত তাঁর ভাবনার প্রকাশ রয়েছে 'মৃত্যু' নামধেয় কবিতাটিতে । যেখানে তিনি বলেছেন :

ওগো মৃত্যু, তুমি যদি হতে শূন্যময়
মুহূর্তে নিখিল তবে হয়ে যেত লয়।
তুমি পরিপূর্ণ রূপ তব বক্ষে কোলে
জগৎ শিশুর মতো নিত্যকাল দোলে। (ঠাকুর ১৪০১ : ৩৫)

এখানে মৃত্যুকে কবি দোলনায় দোল খাওয়া শিশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন, দোলনের একপ্রান্ত যদি জীবন হয় তবে অন্যপ্রান্ত মৃত্যু। মৃত্যুতে জীবনের শেষ নয়, এ-কথা অনেক প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। শেষ বলে যে কিছু নেই, নাটকে-গানে বারবার তার উচ্চকিত ঘোষণা সংশয়কে ব্যক্ত করে না বরং তাঁর স্থির প্রত্যয়ের দৃঢ় অভিব্যক্তিকে ব্যঞ্জিত করে। 'আরম্ভ ও শেষ' কবিতায় তারই পুনরুক্তি :

শেষ কহে একদিন সব শেষ হবে,
হে আরম্ভ, বৃথা তব অহংকার তবে।
আরম্ভ কহিল ভাই, যেথা শেষ হয়
সেইখানে পুনরায় আরম্ভ–উদয়। (ঠাকুর ১৪০১ : ৩৪)

জীবন অনিঃশেষ; অপরাজেয় এই বিশ্বাসে বলীয়ান কবি মহাভারতের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গটিকে অঙ্গীকার করেছেন। অন্তহীন দ্রৌপদীর শাড়ির প্রতীকে কবি জীবনের অনিঃশেষতাকে অভিদ্যোতিত করেছেন :

'সংসার জিনেছি' বলে দুরন্ত মরণ
জীবন বসন তার করিছে হরণ।
যত বস্ত্র টান দেয়, বিধাতার বরে
বস্ত্র বাড়ি চলে তত নিত্য কাল ধরে। (ঠাকুর ১৪০১ : ৩৪)

মানুষকে নিয়তির হাতে বাঁধা পুতুল কল্পনা, আধ্যাত্মিক ভাব-কল্পনায় বিভোর মানুষের স্বভাবজ। রবীন্দ্রনাথ সব সময়ই যে আধ্যাত্মিকতায় মগ্ন ছিলেন তা নয়, কিন্তু চির-অপরিজ্ঞাত রহস্যের সামনে প্রায়ই যে বিমূঢ় হতেন তাঁর সাক্ষ্য দিচ্ছে নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলি:

বাঁশি বলে, মোর কিছু নাহিগো গৌরব
কেবল ফুঁয়ের জোরে মোর কলরব।
ফুঁ কহিল, আমি ফাঁকি, শুধু হাওয়াখানি
যে জন বাজায় তারে কেহ নাহি জানি। (ঠাকুর ১৪০১ : ৩০)

বয়সভেদে আমাদের চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। বাল্যকালে যে-বস্তুর সংগ্রহের জন্যে আমরা মরিয়া চেষ্টা চালাই বয়স কিছুটা বাড়লেই তা আমাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় নিরর্থক হয়ে যায়। 'খেলেনা' নামের কবিতাটিতে কবি সে কথাটিই বলতে চেয়েছেন। শিশুকালে শিশু খেলনার জন্যে ভীষণভাবে আকৃষ্ট থাকে। কোনো কারণে আকাঙ্ক্ষিত খেলনাটি সংগ্রহে ব্যর্থ হলে মনে মনে ভাবে বড়ো হলে যখন সে সামর্থ্যবান হবে সে পৃথিবীর সব খেলনা সংগ্রহ করে ফেলবে। তারপর যখন সে বড়ো হয়, অনেক খেলনা সংগ্রহের সামর্থ্যলাভ করে তখন আর তার খেলনার প্রতি কোনো আগ্রহ অবশিষ্ট থাকে না। যখন সে আরও বড়ো হয় তখন একদিন এই বিরাট খেলাঘর থেকেই বিদায় নিতে হয়। মানবভাগ্যের এই নির্মম সত্য সহজ কথায় অভিব্যক্ত হয়েছে কবিতাটিতে।

জগতে কেউ স্বস্থানে সুখীবোধ করে না। প্রত্যেকে মনে করে সেই কেবল দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে আর বাকি জগজ্জন পরম সুখে-শান্তিতে দিনাতিপাত করছে। এমন ভাবনাকে কবি বেশ কয়েকটি কবিতায় রূপায়িত করেছেন – যার মধ্যে 'প্রবীণ ও নবীন', 'আকাঙ্ক্ষা', 'মোহ' প্রভৃতি বিশিষ্ট। নদীর এপারের বিশ্বাস সব সুখ অন্যপারে, অন্যপার একই সময়ে ভাবে যা কিছু সুখ তা তার বিপরীতপারেই বিরাজ করছে। 'মোহ' কবিতায় মানব জীবনের সত্য নদীর প্রতীকে এভাবেই অভিদ্যোতিত হয়েছে। আবার 'প্রবীণ ও নবীন' কবিতাতে দেখা যায় বৃদ্ধ ব্যক্তি তার পাকাচুলের জন্য সবার সম্মান পান এটা কাঁচা চুলের হিংসার কারণ হয়েছে। পাকাচুল চায় পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে। একই অবস্থা আম ও ইক্ষুর। আম চায় ইক্ষুর মতো সুমিষ্ট-সরল হতে অপরপক্ষে ইক্ষুর বাসনা সে যদি আমের মতো সুস্বাদ, সুগন্ধ লাভ করতে পারতো! নিজ অবস্থা ও অবস্থানে মানুষ যে সন্তুষ্ট হতে পারে না, এই সত্যই এসব কবিতায় পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।

মানুষ জগতের কল্যাণে যা করে যায়, মৃত্যুর পর সেটুকুতেই তার পরিচয় খুঁজে নেয় অন্যরা। মানুষের কর্মের গুরুত্বকে স্বীকার করেন কবি। কর্মের মাঝেই মানুষের পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকে – এই ঋষিবচনের প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে' কবিতায়:

> গন্ধ চলে যায়, হায়, বন্ধ নাহি থাকে,
> ফুল তারে মাথা নাড়ি ফিরে ফিরে ডাকে।
> বায়ু বলে, যাহা গেল সেই গন্ধ তব,
> যেটুকু না দিবে তারে গন্ধ নাহি কব। (ঠাকুর ১৪০১ : ২৭)

দুই, **সমাজ :** সূক্ষ্ম সমাজচিন্তার বেশকিছু পরিচয় রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যে রেখেছেন। আমরা তারই দু-একটি আলোচনা করে এর সত্যতা তুলে ধরছি। 'অধিকার' নামীয় কবিতায় কবি সমাজ-মানসের স্থূলবুদ্ধি ও জড়তাকে ব্যঙ্গ করেছেন অভিনব কৌশলে। বনবাসী লতা-ফুল-গুল্মদের মধ্যে বনের উপর কার অধিকার অধিক বিস্তৃত এমন

বিতর্কের অবতারণা ও তার বিচার প্রসঙ্গ এর প্রতিপাদ্য। সৌন্দর্য-শোভায়, বর্ণে-গন্ধে ফুল বনকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে। বকুলের গন্ধই সম্বল, পলাশের মাত্র বর্ণবিভা, গোলাপের রয়েছে রূপ ও গন্ধ। নিরেট-বুদ্ধি মানুষের কাছে ফুলের এসব গুণ বায়বীয় ব্যাপার। তাদের বিশ্বাস এসব দ্বারা বনের উপর ফুলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। স্থূলবুদ্ধি মানুষ ফুলের পরিবর্তে কচুর দাবির অগ্রগণ্যতা প্রদান করে, কেন না মাটির অভ্যন্তরে কচুই সবচেয়ে বেশি শিকড় ছড়াতে সক্ষম এবং তা প্রত্যক্ষও বটে ! বিচারক যদি এরূপ হন তবে সমাজের দশা কী হবে তা সহজেই কল্পনা করা যায়। বিচারের মাপকাঠি সুবিবেচিত ও সুনির্ধারিত না হলে অকেজো, কেজোর মর্যাদা পেয়ে যায়। সমাজের এ দুর্দিন সেদিনই ঘুচবে যে-দিন মানুষ এ ধরনের প্রত্যক্ষ- প্রমাণ ভুলতে পারবেন।

একটা কুঠার, তার হাতল নেই। কুঠার তাই শালগাছের কাছে একটা ডাল প্রার্থনা করল। ডাল পেলে তা দিয়ে হাতল তৈরি হলো। এরপর কুঠারটি শালগাছটির গোড়াতে কোপ দিতে শুরু করল। 'রাষ্ট্রনীতি' নামক কবিতায় এটুকুই বিবৃত। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারকে রবীন্দ্রনাথ এভাবেই প্রতীকায়িত করেছেন। সকল ক্ষমতার উৎস জনগণের প্রতীক এখানে শালগাছ। ক্ষমতাপ্রার্থী রাজনীতিক দলের প্রতীক কুড়াল। জনগণের সমর্থন ছাড়া রাজনৈতিক দল ক্ষমতা লাভ করতে পারে না। জনগণের দুর্ভাগ্য, তারা যাদের ক্ষমতায়িত করেন ক্ষমতায় গিয়ে অধিকাংশ সময়ই তাদের ভূমিকা হয় জনপীড়কের। শাল ও কুঠারকে যথাক্রমে শাসিত ও শাসকের প্রতীকে উপস্থাপন খুবই চমকপ্রদ ও সফল হয়েছে। রাজনীতিক দলগুলো ক্ষমতা লাভের জন্য যেসব উপায় অনেক সময় গ্রহণ করে তা 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গে'র সঙ্গে তুলনীয়। সরকারিদল ও বিরোধীদল এমন কর্মসূচি গ্রহণ করে যা জনগণের কল্যাণচিন্তা থেকে জাত নয়। দুই শক্তির চাপে জনগণের নাভিশ্বাস ওঠে। 'আত্মশত্রুতা' কবিতাটিকে এরই প্রতীক চিত্ররূপে আবিষ্কার করা সম্ভব। কবিতাটিতে খোঁপা আর এলোচুলের বিবাদ চিত্র রয়েছে। একে অপরকে হীনরূপে চিত্রিত করতে তৎপর। খোঁপা কামনা করে মাথায় যেন টাক পড়ে অন্যদিকে এলোচুলের প্রার্থনা চুল যাতে কাটা পড়ে। দুজনেই ভুলে যাচ্ছে চুল না থাকলে তাদের নিজেদেরই অস্তিত্ব থাকে না। চুলকে জনগণ কল্পনা করলে এবং খোঁপা ও এলোচুলকে সরকারিদল ও বিরোধীদল বিবেচনা করলে সহজেই আমাদের পূর্বোক্ত মতের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হবে।

যে দেশে আমরা জন্মগ্রহণ করি, যার আলো-হাওয়ায় আমাদের বেড়ে ওঠা; সে দেশকে আমরা অনেকেই ভালোবাসতে পারি না। তার মন্দভাগ্যকে আমরা নিজেদের দুর্ভাগ্য বলে বিবেচনা করতে শিখি না। স্বদেশের সমালোচনায় মুখর হই প্রায়শই। কবি 'স্বদেশদ্বেশী' কবিতায় এমন মানুষদের প্রতি ব্যঙ্গের চাবুক হেনেছেন। কেঁচো ও মাটির রূপকে এরকম পরিস্থিতি তৈরি করেছেন। মাটিতে থেকে মাটির রস পান করে

যার জীবন কাটে, সে যখন মাটির নিচুতা, কালো রং নিয়ে নিন্দা করে তখন তো সে জন্মের ঋণই অস্বীকার করে। সমাজস্থ এমন মানুষদের উদ্দেশ্য করে কবি লিখছেন, 'তুমি যে মাটির কীট, খাও তারি রস, / মাটির নিন্দায় বাড়ে তোমারি কি যশ!' (ঠাকুর ১৪০১ : ২৭)।

তিন, **লোকচরিত্র** : *কণিকার* বেশিরভাগ কবিতাতেই রয়েছে লোকচরিত্রের সমালোচনা। আমরা তারই কয়েকটি আলোচনা করে এর বিভিন্ন প্রান্ত চিহ্নিত করতে চেষ্টা করবো। উচ্চাভিলাষ জাগ্রত হলে মানুষ প্রায়শই ভুলে যায় তার বর্তমান অবস্থা, যোগ্যতা ও উৎসের কথা। 'যথার্থ আপন' কবিতায় কবি মানুষের এই চারিত্রিক ত্রুটিকে ব্যঙ্গ করেছেন। কবিতায় বর্ণিত হয়েছে, মাচায় ঝোলা কুমড়া মাটির সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বীকারে অনিচ্ছুক। সে আত্মীয়তা খোঁজে আকাশের সূর্য-চাঁদ-তারার সঙ্গে। মাচাটিকে পুষ্পকরথ কল্পনা করে অহংকারী কুমড়া আকাশে উড়াল দেবার কথা ভাবে কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, নিয়তির মতো বোঁটা তাকে মাটির সঙ্গে যুক্ত রেখেছে। তাই তার আবেদন বৃন্তচ্যুতির। আবদার যখন পূরণ হলো তখন তার গন্তব্য হলো জন্মভূমি। পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে সক্ষম হলো তার যথার্থ আত্মীয়তা কার সঙ্গে।

'মাঝারির সর্তকতা' কবিতায় কবি লিখেছেন : "উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে / তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।" কোনো রাখঢাক না রেখেই মাঝারি মাপের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কবি এভাবেই তুলে ধরেছেন। 'গরজের আত্মীয়তা' কবিতাতে দেখা যায় ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলির সঙ্গে তার আত্মীয়তা ঘোষণা করছে কিন্তু টাকার থলি তা স্বীকারে পরাঙ্মুখ। বাস্তব সমাজেও দেখা যায় – দুর্বল দীনজন, প্রতাপশালী ধনীর আত্মীয়তা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে কিন্তু ধনীজন বেশিরভাগ সময়ই তাদের উপেক্ষা করেন।

সুযোগ সন্ধানী মানুষ প্রায়শই তোষামোদিতে লিপ্ত থাকে। তোষামোদ করে অনেক সময় ফললাভও ঘটে। 'গুনজ্ঞ' কবিতায়, প্রজাপতি ভ্রমরের কাছে জানতে চায় – তার অপরূপ রূপ থাকা সত্ত্বেও সে কেন কবিদের মন পায় না ? জবাবে ভ্রমর স্বীকার করে প্রজাপতির সৌন্দর্য আছে সন্দেহ নেই কিন্তু তার এই গুণপনা প্রজাপতি সরবে ঘোষণা করে বেড়ায় না, এখানেই ভ্রমর জিতে যায়। 'প্রচারেই প্রসার' কথাটির সত্যতা এভাবেই প্রমাণিত হয়। 'স্পর্ধা' কবিতায় মহতের প্রতি ক্ষুদ্রের নিন্দা প্রচারের অপচেষ্টা ও তার অসারতার কথা বর্ণিত। হাউই-এর গর্ব সে তারার মুখে ছাই দিয়ে আসে কিন্তু সে খেয়াল করে না সে ছাই তারই পশ্চাৎগামী হয়। লোকচরিত্রের এসব দিকের প্রতি কবির ব্যঙ্গদৃষ্টি এভাবেই নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

চার, **সাহিত্য বিষয়ক** : সাহিত্য সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি কবিতার কথা বলা যায়। তাদের মধ্যে : 'গদ্য ও পদ্য', 'নিন্দুকের দুরাশা', 'সমালোচক' ও 'অসম্ভব ভালো' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমালোচক ও লেখক এ দুইয়ের বৈরিতা বহুবিদিত।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালে অসূয়াপ্রবণ কতিপয় সমালোচক কর্তৃক ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন। সমালোচনাও যে শিল্পকর্ম সে কথা আমরাও ভুলছি না তবে একদেশদর্শী সমালোচনাও তো আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ নয়। 'কীটের বিচার' কবিতায় দেখা যায় 'মহাভারত' গ্রন্থটিকে কীট কেটেকুটে শেষ করে ফেলেছে। তাতে স্বাভাবিকভাবেই পণ্ডিত ক্ষিপ্ত, কিন্তু নির্বোধ কীটের নির্লিপ্ত জবাব –

কীট বলে, 'হয়েছে কী ! কেন এত রাগ!
ওর মধ্যে ছিল কী বা, শুধু কালো দাগ।
আমি যেটা নাহি বুঝি সেটা জানি ছার,
আগাগোড়া কেটেকুটে করি ছারখার। (ঠাকুর ১৪০১ : ১০)

নিজের সীমাবদ্ধতার কারণে যখন সমালোচক কোনো শিল্পের মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন, তখন নিজের সীমাবদ্ধতার বিচার না করে অনেক সময় সমালোচক শিল্পটিকেই নাকচ করে দেন। এমনতর সমালোচকদের অবস্থা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ কীটের শরণাপন্ন হয়েছেন। শিল্পের রস আস্বাদনের জন্যে 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী' হবার যে কথা প্রচলিত, তা অনায়ত্ত থাকলে শিল্পের সৌন্দর্য উপভোগ সম্ভব হয় না। যেমনটি ঘটেনি 'নিন্দুকের দুরাশা' কবিতার ছুঁচের ভাগ্যে। ছুঁচ প্রতিদিন হাজার হাজার ফুল ফুঁড়ে ফুঁড়ে মালা গাঁথে কিন্তু ফুলের বর্ণ-গন্ধ-শোভার কোনো সন্ধান সে জানে না। তেমনই দুর্ভাগ্য অনেকেরই, যারা শিল্পের কারবারি হয়েও শিল্পের সৌন্দর্য-মাধুর্যের সত্যিকার সাক্ষাৎ লাভে সক্ষম হন না। এ-কবিতায়ও কবি প্রাণহীন সমালোচকদের নিন্দুক ছুঁচরূপে চিত্রিত করেছেন।

শিল্প আগে, সমালোচনা পরে। অনেক সময়ই সমালোচক ভুলে যান, শিল্পের জন্য সমালোচনা, সমালোচনার জন্য শিল্প নয়। প্রাণহীন, যুক্তিবিচারহীন বিদ্বিষ্ট সমালোচককে উদ্দেশ্যে করেই 'সমালোচক' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "তোমার যা মূল্য তার ঢের বেশি কথা"। রবীন্দ্রনাথ *বিসর্জন* নাটকের উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন: 'রক্ত-মাংস গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে'। ক্রিটিকদের 'ভালো হতো আরো ভালো হলে' এ ধরনের বাধাবুলিই মূলত তার ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে 'অসম্ভব ভালো' কবিতায়। ভালোত্ব যখন পরিমেয় নয় তখন ঐরূপ মন্তব্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। কবি ঐ ধরনের সমলোচনা ও সমালোচককে ব্যঙ্গ করেই বলেছেন, আরো ভালো মূলত থাকে – 'অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায়'।

শর কহে, আমি লঘু, গুরু তুমি গদা,
তাই বুক ফুলাইয়া খাড়া আছ সদা।
করো তুমি মোর কাজ, তর্ক যাক চুকে –
মাথা ভাঙা ছেড়ে দিয়ে বেঁধো গিয়ে বুকে। (ঠাকুর ১৪০১ : ২৩)

'গদ্য ও পদ্য' কবিতায় মাত্র দুই চরণে কবি এদের প্রভেদকে মূর্ত করেছেন। পদ্যের আকর্ষণ হৃদয়ে, কারণ আবেগই তার সম্বল আর গদ্যের লক্ষ্য মস্তিষ্ক, কেননা, তা

যুক্তি-বুদ্ধি নির্ভর। শরকে পদ্যের আর গদাকে গদ্যের প্রতিনিধিত্ব দান করে কবি বলতে চান, একের কাজ অন্যেকে দিয়ে হয় না।

*কণিকায়* ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের প্রতিষ্ঠাদান রবীন্দ্রনাথের অনন্যতারই সাক্ষী। *কণিকার* ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলোতে ফুটে উঠেছে সত্যদ্রষ্টা দার্শনিক কবির জগৎ-জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার নির্যাস। অনেকখানি ভাব মরে এলে একটুখানি ভাষায় প্রকাশ করার কথা প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, *কণিকা* তারই মূর্তিমান প্রকাশ। হাস্যরস-ব্যঙ্গের মাধ্যমে সত্যের প্রকাশ ঘটানো নতুন ব্যাপার নয় সত্যি, তবে লাঠি না ভেঙে সাপ মারার মতো এই কৌশল খুব কার্যকরী। সাহিত্যে রূপক-প্রতীকের ব্যবহার পূর্বোক্ত কৌশলেরই ধারাবাহিকতা। রবীন্দ্রনাথ কলা-কৌশল হিসেবে এ-সবকেই অঙ্গীকার করেছেন। বিষয়গত সৌন্দর্যের সঙ্গে আঙ্গিকগত সৌন্দর্যের ব্যাপারেও তিনি সমান সচেতন ছিলেন। ছন্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অনুপ্রাস, শ্লেষ-যমক প্রভৃতির উপস্থিতি তারই সাক্ষ্যবাহী। তাই *কণিকা* কেবল ছন্দোবদ্ধ উপদেশ নয়, সত্যের সুন্দরতর প্রকাশও বটে।

## গ্রন্থপঞ্জি

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৪০১)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, কলিকাতা : বিশ্বভারতী

বসু, অরুণকুমার (১৯৮৭)। *ক্ষণিকের বাণী-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা : টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট

ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ (১৩৯৩)। *রবীন্দ্র-কাব্য পরিক্রমা*, কলিকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার (১৩৫৩)। *রবীন্দ্রজীবনী*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা : বিশ্বভারতী

রহমান, বদিউর সম্পাদিত. (২০১১)। *সাহিত্য–সংজ্ঞা অভিধান*, ঢাকা : গতিধারা

রায়, নীহাররঞ্জন (১৩৬৯)। *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*, কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

Cuddon. A. J. (1977), *A Dictionary of Literary Terms*, London : Penguin Books